

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২৪ (শেষ পর্ব)

সূরা ফাতিহা

‘সূরাতুল ফাতিহাহ’ অর্থ মুখবন্ধ বা ভূমিকার সূরা। ইমাম কুরতুবী বলেন, একে ‘ফাতিহাহ’ এজন্য বলা হয় যে, এই সূরার মাধ্যমে কুরআন পাঠ শুরু করা হয়। এই সূরার মাধ্যমে কুরআনের সংকলন কাজ শুরু হয়েছে এবং এই সূরার মাধ্যমে সালাত শুরু করা হয়। এটি মক্কায় অবতীর্ণ ১ম ও পূর্ণাঙ্গ সূরা। এতে ৭টি আয়াত, ২৫টি কালেমা বা শব্দ এবং ১১৩টি হরফ বা বর্ণ রয়েছে। সূরাটি কুরআনের মূল, কুরআনের ভূমিকা ও ছালাতের প্রতিরাক‘আতে পঠিতব্য সাতটি আয়াতের সমষ্টি ‘আস-সাব‘উল মাছানী’ নামে সহীহ হাদীসে ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন - ‘আমরা তোমাকে প্রদান করেছি বারবার পঠিতব্য সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন’ (হিজর ১৫/৮৭)।

নামকরণ

ভিন্ন হাদীস, আছার ও বিদ্বানগণের নামকরণের মাধ্যমে অনূন ৩০টি নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহীহ হাদীসসমূহে এসেছে ৮টি। যেমন : (১) উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। (২) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। (৩) আস-সাব‘উল মাছানী (সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)। (৪) আল-কুরআনুল ‘আযীম (মহান কুরআন)। (৫) আল-হামদু (যাবতীয় প্রশংসা)। (৬) সালাত। (৭) রুক্কিয়াহ (ফুঁকদান)। (৮) ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনের মুখবন্ধ)।

সূরা ফাতিহার আরো কিছু নাম হলো- শিফা (আরোগ্য), আসাসুল কুরআন (কুরআনের ভিত্তি), কাফিয়াহ (যথেষ্ট), ওয়াফিয়াহ (পূর্ণ), ওয়াক্বিয়াহ (হেফায়তকারী), ফাতিহাতুল কুরআন, সূরাতুল হাম্দ, শুক্র, ফাতিহাহ, মিন্নাহ, দো‘আ, সওয়াল, মুনাজাত, তাফতীয, মাসআলাহ, রা-ক্বিয়াহ, নূর, আল-হাম্দুলিল্লাহ, ইল্লুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্দিলা উলা, সূরাতুল হাম্দিলা কুছরা’। এইভাবে নাম বৃদ্ধির ফলে সূরা ফাতিহার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবতরণকাল

সর্বপ্রথম সূরা ‘আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত মক্কায় নাযিল হয়। অতঃপর কয়েক দিন অহি-র বিরতিকাল শেষে সূরা মুদাচ্ছির-এর প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয়। অন্য বর্ণনায় ৭টি আয়াতের কথা এসেছে। তারপরে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো। মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাংখা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাংখিত বস্তুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া

হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস--- একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায্যভুক্ত নয়। বরং এ মধ্যকার আসল সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায্যভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন- এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

দো‘আর আদব :

অত্র সূরাতে দো‘আ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ১ম হ’তে ৩য় আয়াত পর্যন্ত যার নিকটে প্রার্থনা করা হবে, সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। অতঃপর ৪র্থ আয়াতে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়েছে ও কেবলমাত্র তাঁর নিকট থেকেই সাহায্য কামনার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর ৫ম আয়াতে মূল দো‘আর বিষয়বস্তু সিরাতে মুস্তাক্কীম-এর হেদায়াত প্রার্থনা করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াতদ্বয় মূলতঃ ৫ম আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এসেছে। এইভাবে প্রার্থনা নিবেদন শেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে ‘আমীন’ বলে দো‘আ কবুলের আবেদন করতে বলেছেন। মোটকথা প্রথমে প্রশংসা ও আনুগত্য নিবেদন করার পরে দো‘আ পেশ করা হয়েছে। একইভাবে সালাতের বাইরে আল্লাহর জন্য হামদ ও রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরুদ পেশ করার পরে দো‘আ করা হ’ল দো‘আর সুম্মাতী তরীকা।

সূরা ফাতিহার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

(১) এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত সূরা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তাওরাত, যবুর, ইনজীল এবং কুরআনে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই।[বুখারী হা/৪৭০৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪২]

(২) এই সূরা এবং সূরায় বাক্বারাহর শেষ তিনটি আয়াত হল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। [মুসলিম হা/৮০৬ অধ্যায়-৬, ‘সূরা ফাতিহার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ-৪৩, মিশকাত হা/২১২৪]

(৩) উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, (লা ছালা-তা লিমান লাম ইয়াক্বরা’ বিফা-তিহাতিল কিতা-ব) ‘ঐ ব্যক্তির সালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না’।

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘ঐ সালাত সিদ্ধ নয়, যাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয় না’...।

(৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েণ ও তিনি সুস্থ হন...। এজন্য এ সূরাকে রাসূল (সাঃ) ‘রুক্বইয়াহ’ (الرُّقْيَةُ) বলেছেন। কেননা এই সূরা পড়ে ফুক দিলে আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

(৭) ইমাম কুরতুবী বলেন, সূরা ফাতিহাতে যে সকল ‘ছিফাত’ রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। এমনকি একেই ‘আল-কুরআনুল আযীম’ বা মহান কুরআন বলা হয়েছে (হিজর ১৫/৮৭)।

পরের সূরার সাথে সম্পর্কঃ এই সূরার ৫ম আয়াতে আমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান চাই। তার রেসপন্স আল্লাহ পরের (২য়) সূরা আল বাকারাতেই দিয়ে দিয়েছেন। সূরার ২য় আয়াতেই কুরআনকেই আল্লাহ সরল সঠিক পথ হিসাবে বর্ণনা করেছেন!

শেষ সূরার সাথে মিলঃ সূরা আল ফাতিহার ১ম আয়াতে ‘রব্বিল আলামীন’ (সারা জাহানের রব) বলা হয়েছে আল্লাহকে আর শেষ সূরায় ‘রব্বিন নাস’ (মানুষের রব) বলা হয়েছে। সূরা আল ফাতিহার ৩য় আয়াতে ‘মালিকি ইয়াওমদ্দীন’ (বিচার দিনের মালিক) বলা হয়েছে আর সূরা আন নাসের ২য় আয়াতে ‘মালিকিন নাস’ (মানুষের মালিক) বলা হয়েছে। সূরা আল ফাতিহার ৪র্থ আয়াতে ‘ইয়্যাকা না’বুদু’ (আমরা তোমারই ইবাদত করি) বলা হয়েছে আর সূরা আন নাসের ৩য় আয়াতে বলা হচ্ছে ‘ইলাহিন নাস’ (মানুষের মাবুদের নিকট)। সূরা আল ফাতিহায় পথনির্দেশ চাওয়া হয়েছে আর সূরা আন নাসে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যাবে। একঃ মানুষ অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার আছে কি না? দুইঃ বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিনঃ এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফেরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে বহু হাদীছ এসেছে। ‘বিসমিল্লাহ’ হল দুই জিন ও মানুষের লজ্জাস্থানের পর্দা স্বরূপ। গৃহে প্রবেশ করা ও বের হওয়া, বাড়ীর দরজা বন্ধ করা, বাতি নেভানো, পাত্র ঢাকা, বোতলের মুখ লাগানো, চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা, ওয়ূ-গোসল, খানা-পিনা, যবহ ইত্যাদি সকল শুভ কাজের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলার জন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে নির্দেশ এসেছে। কিন্তু যেসকল ইবাদতের পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ বলার বিধান নেই, সেসবের শুরুতে তা বলা যাবে না। যেমন আযান, ইকামত, ছালাত প্রভৃতির শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা। এ ব্যাপারে আরও বহু সহীহ হাদীস এসেছে। আবার কোথাও কোথাও ‘বিসমিল্লাহ’ বলা ওয়াজিবও বটে যেমন, যবাই করতে [বুখারী: ৯৮৫, মুসলিম: ১৯৬০]

১. সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

আরবী ভাষায় হামদ অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সীমাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হামদ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের যা কিছু এবং যতকিছু ভাল, সৌন্দর্য-মাধুর্য, পূর্ণতা মাহাত্ম্য দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তা যেখানেই এবং যে কোন রূপে ও যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট, একমাত্র তিনিই-তার মহান সত্তাই সে সব পাওয়ার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্যই এর যোগ্য হতে পারে না। কেননা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তার সব সৃষ্টিই অতীব সুন্দর। এর অধিক সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তার সৃষ্টি, লালন-পালন-সংরক্ষণ-প্রবৃদ্ধি সাধনের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাই এর দরুন মানব মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠা প্রশংসা ও ইচ্ছামূলক প্রশংসাকে হামদ বলা হয়। এখানে এটা বিশেষভাবে জানা আবশ্যিক যে, “আল-হামদু” কথাটি ‘আশ-শুকর’ থেকে অনেক ব্যাপক, যা আধিক্য ও পরিপূর্ণতা বুঝায়। কেউ যদি কোন নিয়ামত পায়, তা হলে সেই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সে ব্যক্তি যদি কোন নিয়ামত না পায় (অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোন লোক নিয়ামতটি পায়) স্বভাবতঃই তার বেলায় এজন্য শুকরিয়া নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ামত পায়, সে-ই শুকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি নিয়ামত পায় না, সে শুকরিয়া আদায় করে না। এ হিসেবে ‘আশ-শুকর লিল্লাহ’ বলার অর্থ হতো এই যে, আমি আল্লাহর যে নিয়ামত পেয়েছি, সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। অপরদিকে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ অনেক ব্যাপক। এর সম্পর্ক শুধু নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহর যত নেয়ামত আছে, তা পাওয়া যাক, বা না পাওয়া যাক; সে নিয়ামত কোন ব্যক্তি নিজে পেলো, বা অন্যরা পেলো, সবকিছুর জন্যই যে প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য সেটিই হচ্ছে হামদ। এ প্রেক্ষিতে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে বান্দা যেন ঘোষণা করে, হে আল্লাহ! সব নিয়ামতের উৎস আপনি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টিজগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবে আপনার আর কারও নয়। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি প্রশংসিত হবেন আর কেউ প্রশংসা না করলে প্রশংসিত হবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি স্বপ্রশংসিত। প্রশংসা আপনার স্থায়ী গুণ। প্রশংসা আপনি ভালবাসেন। আপনার প্রশংসা কোন দানের বিনিময়ে হতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। [ইবন কাসীর]

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে الْحَمْدُ ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’ এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। الْحَمْدُ ‘আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি’ এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, আহমাদুল্লাহ বা ‘আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি’ এ বাক্যটি বর্তমানকালের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমানকালে আল্লাহর প্রশংসা করছি। অন্যদিকে আল-হামদুলিল্লাহ বা ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর’ সর্বকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) প্রযোজ্য। আর এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ “সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো, আল-হামদুলিল্লাহ”। [তিরমিযী: ৩৩৮৩] কারণ, তা সর্বকাল ব্যাপী। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ “আর ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ মীযান পূর্ণ করে” [মুসলিম: ২২৩] এ জন্য অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাত্রির যিকর ও সালাতের পরের যিকর এর মধ্যে এ “আল-হামদুলিল্লাহ” শব্দই শিখিয়েছেন। এ “আল-হামদুলিল্লাহ” পূর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ এতে খুশী হন। বিশেষ করে নেয়ামত পাওয়ার পর বান্দাকে কিভাবে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে তাও “আল-হামদুলিল্লাহ” শব্দের মাধ্যমে করার জন্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শিখিয়ে দিয়েছেন। দেখুন, [ইবনে মাজাহ, ৩৮০৫] এভাবে “আল-হামদুলিল্লাহ” হলো সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার রূপ। আল্লাহর হামদ প্রকাশ করার

ক্ষেত্র, মানুষের মন-মানষ, মুখ ও কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় শক্তি দিয়ে আল্লাহর হামদ করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ রাখে। অনেকে মুখে ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর প্রশংসা আসেনি আর তার কর্মকাণ্ডেও সেটার প্রকাশ ঘটে না।

সকল হামদ আল্লাহর এ কথাটুকু দ্বারা এক বিরাট গভীর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই যে বস্তুতেই যা কিছু সৌন্দর্য ভাল প্রশংসার যোগ্য গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে, মনে করতে হবে যে, তা তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বকীয় গৌরবের বস্তু নয়। কেননা সেই গুণ মূলতঃই তার নিজের সৃষ্টি নয়; তা সেই আল্লাহ তা‘আলারই নিরঙ্কুশ দান, যিনি নিজের কুদরতে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত ভালোর মূল উৎস। মানুষ, ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-প্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য-যেখানেই যা কিছু সৌন্দর্য ও কল্যাণ রয়েছে, তা তাদের কারো নিজস্ব নয়, সবই আল্লাহর দান। অতএব এসব কারণে যা কিছু প্রশংসা হতে পারে তা সবই আল্লাহর প্রাপ্য। এসব সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহর সাথে কেউ শরীক ছিলনা, কাজেই এসব কারণে যে প্রশংসা প্রাপ্য হতে পারে তাতেও আল্লাহর সাথে কারো এক বিন্দু অংশীদারিত্ব থাকতে পারে না। সুন্দর, অনুগ্রহকারী, সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা, রক্ষকর্তা ও ক্রমবিকাশদাতা আল্লাহর প্রতি মানুষ যা কিছু ভক্তি-শ্রদ্ধা ইবাদত-বন্দেগী এবং আনুগত্য পেশ করতে পারে; তা সবই একমাত্র আল্লাহর সামনেই নিবেদন করতে হবে। কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তার এক বিন্দুরও দাবীদার হতে পারে না। বরং তারই রয়েছে যাবতীয় হামদ। হামদ জাতীয় সবকিছু কেবল তারই প্রাপ্য, কেবল তিনিই সেটার একমাত্র যোগ্য। তাছাড়া ভালো বা মন্দ সকল অবস্থায় কেবল এক সত্তারই হামদ বা প্রশংসা করতে হয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা‘আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি কোন খারাপ কিছুর সম্মুখীন হয়, তখনও যেন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ বা সর্বাবস্থায় আল্লাহর জন্যই যাবতীয় হামদ। [ইবন মাজাহ: ৩৮০৩]

কুরআন হাদীস হতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির গুণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার এতখানি প্রশংসাও করা যায় না যাতে তার ব্যক্তিত্বকেই অসাধারণভাবে বড় করে তোলা হয় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মূলতঃ এইরূপ প্রশংসাই মানুষকে তাদের পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে বলেছেনঃ “যখন বেশী বেশী প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ কর।” [মুসলিম: ৩০০২] নতুবা তার মনে গৌরব ও অহংকারী ভাবধারার উদ্বেক হতে পারে। হয়ত মনে করতে পারে যে, সে বহুবিধ গুণ-গরিমার অধিকারী, তার বিরাট যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে। আর কোন মানুষ যখন এই ধরনের খেয়াল নিজের মনে স্থান দেয় তখন তার পতন হতে শুরু হয় এবং সে পতন হতে উদ্ধার হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অপর কারো গুণ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করতে শুরু করে, তখন মানুষ তার ভক্তি-শ্রদ্ধার জালে বন্দী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে মানুষের দাসত্ব ও মানুষের পূজা করতে আরম্ভ করে। এই অবস্থা মানুষকে শেষ পর্যন্ত চরম পঙ্কিল শিকের পথে পরিচালিত করতে পারে। সে জন্যই যাবতীয় ‘হামদ’ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

‘আলামীন’ বহুবচন শব্দ, একবচনে ‘আলাম’। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ‘আলাম’ বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অপর কোন জিনিস সম্পর্কে জানবার মাধ্যম হয়; যার দ্বারা অন্য কোন বৃহত্তর জিনিস জানতে পারা যায়।

সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতঃই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক। এই জন্য সৃষ্টিজগতকে আলাম এবং বহুবচনে আলামীন বলা হয়। [কাশশাফ] আলামীন' বলতে কি বুঝায়, যদিও এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি, কিন্তু অপর আয়াতে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে, قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ فِر'আউন বললঃ রাব্বুল আলামীন কি? মুসা বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন এবং এ দুটির মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের রব। (সূরা আশ-শু'আরা: ২৩-২৪] এতে আলামীন' এর তাফসীর হয়ে গেছে যে, সৃষ্টি জগতের আর সব কিছুই এর অধীন। আসমান ও যমীনে এত অসংখ্য 'আলাম' বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত সেগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় নি। মানব-জগত, পশু-জগত, উদ্ভিদ-জগত-এই জগত সমূহের কোন সীমা-সংখ্যা নাই, বরং এগুলো অসীম অতলস্পর্শ জগত-সমুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। মানব-বুদ্ধি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয়।

'রব' শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু-লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ-সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিয়িক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া ভাঙ্গা গড়ার অধিকারী হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু প্রদান করা, সন্তান দেয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি যাবতীয় অর্থই এতে নিহিত আছে। আর যিনি এক সঙ্গে এই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন রব। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আলায় এইরূপ ব্যাপক অর্থে রব শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى * وَالَّذِي أَوْفَىٰ بِالْعَهْدِ * وَالَّذِي يَدْعُو مِن دُونِهِ * سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ * [সূরা আল-আলা: ১-৩] এই আয়াত হতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, রব তাকেই বলতে হবে যার মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার এবং হেদায়েত, দ্বীন ও শরীআত প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ সত্তার গুণে মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব-ভূবনকে সৃষ্টি করেছেন; শুধু সৃষ্টিই নয়-যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে নিজ নিজ স্থানে বসে গেছে। রব তিনিই-যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য নিজের একটি ক্ষেত্র এবং তার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا [সূরা আল-ফুরকান: ২]

অতএব এক ব্যক্তি যখন আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই ঘোষণা করে যে, আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৈহিক, আধ্যাত্মিক, দ্বীনী ও বৈষয়িক-যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। আমার এই সবকিছু একমাত্র তারই মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমার সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই। আর কেউ তার কোন কিছু পূরণ করার অধিকারী নয়। বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকে আল্লাহর দু'ধরনের রবুবিয়াত কার্যকর দেখা যায়: সাধারণ রবুবিয়াত বা প্রকৃতিগত এবং বিশেষ রবুবিয়াত বা শরীআতগত।

ক) প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিমূলক- মানুষের জন্ম, তাহার লালন পালন ও ক্রমবিকাশ দান, তার শরীরকে ক্ষুদ্র হতে বিরাটত্বের দিকে, অসম্পূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা এবং তার মানসিক ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতা দান।

খ) শরীয়াত ভিত্তিক-মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে পথ প্রদর্শন করা, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নির্দেশের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ। যারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণত্ব বিধান করেন। এদেরই মাধ্যমে তারা হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়। নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকতে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলময় পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

অতএব, আল্লাহ তা'আলার জন্য মানুষের রব হওয়ার ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের রব হওয়া কেবল এই জন্যই নয় যে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের লালন পালন করেছেন এবং তাহার দৈহিক শৃঙ্খলাকে স্থাপন করেছেন। বরং এজন্যও তিনি রব যে, তিনি মানুষকে আল্লাহর বিধান মুতাবিক জীবন যাপনের সুযোগদানের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে সেই ইলাহী বিধান দান করেছেন।

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

২. দয়াময়, পরম দয়ালু।

‘রহমান-রাহীম’ শব্দদ্বয়ের কারণে মূল আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত এবং সকল প্রকার প্রশংসার একচ্ছত্র অধিকারী কেবল এই জন্য নয় যে তিনি রবুল আলামীন, বরং এই জন্যও যে, তিনি “আর-রাহমান” ও “আর-রাহীম”। বিশ্বের সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার অপার অসীম দয়া ও অনুগ্রহ প্রতিনিয়ত পরিবেশিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক জগতে এই যে নিঃসীম শান্তি শৃংখলা ও সামঞ্জস্য-সুবিন্যাস বিরাজিত রয়েছে, এর একমাত্র কারণ এই যে, আল্লাহর রহমত সাধারণভাবে সব কিছুর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে। কাফির, মুশরিক, আল্লাহ্‌দ্রোহী, নাস্তিক, মুনাফিক, কাউকেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত হতে জীবন-জীবিকা ও সাধারণ নিয়মে বৈষয়িক উন্নতি কোন কিছু থেকেই- বঞ্চিত করেন নি। এমন কি, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তার বিরোধিতা করতে চাইলেও আল্লাহ নিজ হতে কাউকেও বাধা প্রদান করেন নি; বরং তিনি মানুষকে একটি সীমার মধ্যে যা ইচ্ছে তা করারই সুযোগ দিয়েছেন। এই জড় দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই আল্লাহর নিয়ম। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, “আর আমার রহমত সব কিছুকেই ব্যাপ্ত করে আছে।” [সূরা আল-আরাফ: ১৫৬]

কিন্তু এই জড় জগত চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবার পর যে নূতন জগত স্থাপিত হবে, তা হবে নৈতিক নিয়মের বুনিন্যাদে স্থাপিত এক আলাদা জগত। সেখানে আল্লাহর দয়া অনুকম্পা আজকের মত সর্বসাধারণের প্রাপ্য হবে না। তখন আল্লাহর রহমত পাবে কেবলমাত্র তারাই যারা দুনিয়ায় আখেরাতের রহমত পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। ‘রাবুল আলামীন’ বলার পর ‘আর-রাহমান’ ও ‘আর-রাহীম’ শব্দদ্বয় উল্লেখ করায় এই কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ বিশ্ব-লোকের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্রমবিকাশ দানের যে সুষ্ঠু ও নিখুত ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন, তার মূল কারণ সৃষ্টির প্রতি তার অপারিসীম দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনুরূপভাবে ‘রাহমান’ এর পর ‘রাহীম’ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলতে চান যে, দুনিয়াতে আল্লাহর নিরপেক্ষ ও সাধারণ রহমত লাভ করে কেউ যেন অতিরিক্ত মাত্রায় মেতে না যায় এবং আল্লাহ ও তার দেয়া দ্বীনকে ভুলে না বসে। কেননা দুনিয়ার জীবনের পর আরও একটি জগত, আরও একটি জীবন

নিশ্চিতরূপে রয়েছে, যখন আল্লাহর রহমত নির্বিশেষে আনুগত্যশীল বান্দাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনই হবে সর্বোত্তমভাবে সাফল্যমণ্ডিত।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

৩. বিচার দিনের মালিক।

অত্র আয়াতে مَالِكِ ও সূরা নাসে مَالِكِ বলা হয়েছে। مَالِكِ শব্দটির অর্থ অধিকতর ব্যাপক। مَالِكِ বলে কেবল ‘মানুষের অধিপতি’ বলা হয়েছে। কিন্তু مَالِكِ বলে এখানে সৃষ্টিকুলের অধিপতি বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টি জগতের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সকল কিছুর চিরন্তন মালিকানা তাঁর হাতে। শাসক যেমন অধীনস্তদের নিয়োগ দান করেন ও তাদেরকে শাসকের নিকটে দায়বদ্ধ থাকতে হয়, অমনিভাবে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে বান্দাকে তিনি বিশ্বপরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বান্দার কর্মজীবনের ছোট-বড় সবকিছুই আল্লাহর গোচরে রয়েছে এবং ক্রিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত হিসাব তিনি গ্রহণ করবেন ও সে অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের পুরস্কার দান করবেন। তিনি ইচ্ছা করলে কোন বান্দাকে বিনা হিসাবেও জান্নাত দিতে পারেন। ফলতঃ বিচার দিবসের পূর্ণ মালিকানা ও একচ্ছত্র অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই হাতে। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারবে না। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

الدِّينِ-এর অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন প্রতিদান, হিসাব, ফায়সালা, আনুগত্য, রীতি, আচরণ ইত্যাদি। এখানে الدِّينِ-এর অর্থ الجزاء অর্থঃ প্রতিদান বা হিসাব-এর দিন। যেমন বলা হয়ে থাকে, كَمَا تَدِينُ ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’।

মোটকথা: আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি তিনি কেবল ‘রব্বুল আলামিন, আর-রহমান ও আর-রহিমই নন, তিনি “মালিকি ইয়াওমদিন”-ও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন। অর্থাৎ তোমরা কেউ মনে করো না যে, এই জীবনের অন্তরালে কোন জীবন নেই। এই ধারণাও মনে স্থান দিও না যে, সেদিনও তোমাদের তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা চলবে যেমন আজ চলছে বলে তোমরা ধারণা করছ বরং সে দিন নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও মালিকানা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর থাকবে। আজ যেমন তোমরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারছ-অন্ততঃ এর পথে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় না, সে চূড়ান্ত বিচার দিনে কিন্তু তা কিছু মাত্র চলবে না। সেদিন কেবলমাত্র আল্লাহর মজি কার্যকর হবে। আজ যেমন লোকেরা সত্যের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে সুস্পষ্ট অন্যায় ও মারাত্মক যুলুম করেও সুনাম সুখ্যাতিসহ জীবন-যাপন করতে পারছে, সেদিন কিন্তু এসব ধোঁকাবাজী এক বিন্দুও চলবে না।

বিচার দিবসের গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য আন্দাজ করা যায় এই কথা হতে যে, বিচারের দিন জিজ্ঞেস করা হবে, “আজকার দিনে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব কার?” তার উত্তরে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হবে, “তা সবই একমাত্র সার্বভৌম ও শক্তিমান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট” [সূরা আল-গাফির: ৫৯], অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, “এটা সে দিনের কথা যেদিন কোন লোকই অন্য কারও জন্য কিছু করতে সক্ষম হবে না। সে দিন সমস্ত কর্তৃত্বই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য” [সূরা আল-ইনফিতার: ১৯] আল্লাহর এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কার্যকর

হবে প্রথম সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিন হতেই। বলা হয়েছে, “আর তার নিরঙ্কুশ মালিকানা কার্যকর হবে সিংগায় ফুঁক দেয়ার দিনই [সূরা আল আন'আম: ৭৩]

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

৪. আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

ইবাদতের অর্থ হল, কারো সম্ভ্রুতি লাভের জন্য অত্যধিক কাকুতি-মিনতি এবং পূর্ণ নম্রতা প্রকাশ করা। আর ইবনে কাসীর (রঃ) এর উক্তি অনুযায়ী ‘শরীয়তে পূর্ণ ভালবাসা, বিনয় এবং ভয়-ভীতির সমষ্টির নাম হল ইবাদত।’ অর্থাৎ, যে সত্তার সাথে ভালবাসা থাকবে তাঁর অতিপ্রাকৃত মহাক্ষমতার কাছে অসামর্থ্য ও অক্ষমতার প্রকাশও হবে এবং প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা তাঁর পাকড়াও ও শাস্তির ভয়ও থাকবে। এই আয়াতে সরল বাক্য হল, [نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ] (আমরা তোমার ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই।) কিন্তু মহান আল্লাহ এখানে مفعول (কর্মপদকে) فعل (ক্রিয়াপদ)-এর আগে এনে [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ] বলেছেন। আর এর উদ্দেশ্য বিশেষত্ব সৃষ্টি করা। (যেহেতু আরবী ব্যাকরণে যে পদ সাধারণতঃ পরে ব্যবহার হয় তা পূর্বে প্রয়োগ করা হলে বিশেষত্বের অর্থ দিয়ে থাকে।) সুতরাং এর অর্থ হবে, ‘আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।’ এখানে স্পষ্ট যে, ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়েয নয়, যেমন সাহায্য কামনা করাও তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে বৈধ নয়। এই বাক্য দ্বারা শিরকের পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের অন্তরে শিরকের ব্যাধি সংক্রমণ করেছে, তারা লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্যকে দৃষ্টিচ্যুত করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। তারা বলে, দেখুন! যখন আমরা অসুস্থ হই, তখন সুস্থতার জন্য ডাক্তারের নিকট সাহায্য চাই। অনুরূপ বহু কাজে স্ত্রী, চাকর, ড্রাইভার এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও সাহায্য কামনা করি। এইভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছেও সাহায্য কামনা করা জায়েয। অথচ প্রাকৃত বা লৌকিক সাহায্য একে অপরের নিকট চাওয়া ও করা সবই বৈধ; এটা শিরক নয়। এটা তো মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এমন এক নিয়ম-নীতি, যাতে সমস্ত লৌকিক কার্য-কলাপ বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। এমন কি নবীরাও (সাধারণ) মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, [مَنْ أُنْصَرِيَ إِلَيَّ] অর্থাৎ, কারা আছে যারা আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? (সূরা আলে ইমরান ৫২ আয়াত) আর আল্লাহ তা'য়ালার মু'মিনদেরকে বলেন, [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى] অর্থাৎ, তোমরা নেকী এবং আল্লাহভীতির কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। (সূরা মাইদাহ ২ আয়াত) বুঝা গেল যে, এ রকম সাহায্য (চাওয়া ও করা) নিষেধও নয় এবং শিরকও নয়। বরং তা বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ। পারিভাষিক শিরকের সাথে এর কি সম্পর্ক? শিরক তো এই যে, এমন মানুষের কাছে সাহায্য কামনা করা যে বাহ্যিক হেতুর ভিত্তিতে কোন সাহায্য করতে পারবে না। যেমন, কোন মৃত ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করা, তাকে বিপদ থেকে মুক্তিদাতা এবং প্রয়োজন পূরণকারী মনে করা, তাকে ভাল-মন্দের মালিক ভাবা এবং বিশ্বাস করা যে, সে দূর এবং নিকট থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার ক্ষমতা রাখে। এর নাম হল, অলৌকিক পন্থায় সাহায্য চাওয়া এবং তাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা। আর এরই নাম হল সেই শিরক, যা দুর্ভাগ্যক্রমে অলী-আওলিয়াদের মহব্বতের নামে মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে।

‘তোমার ইবাদত করি’ একথাটুকু বুঝানোর জন্য نَعْبُدُক বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ঐ কর্মপদের সর্বনামকে নিয়মমাফিক نَعْبُدُক্রিয়ার পরে না বসিয়ে পূর্বে বসানোর মূল কারণ হ'ল বক্তব্যের মধ্যে Emphasis বা জোর সৃষ্টি করা। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আগে বলাই আরবদের বাকরীতি। কেননা ‘তোমার ইবাদত করি’ বললে

অন্যকেও ইবাদত করার সম্ভাবনা বাকী থাকে। কিন্তু ‘তোমারই ইবাদত করি’ বললে সে সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। ٱللَّهُ সর্বনাম একই বাক্যে দু’বার অগ্রে বসানোর পিছনেও উদ্দেশ্য হ’ল একথা জোর দিয়ে বলা যে, আমাদের যাবতীয় ইবাদত ও ইস্তি‘আনাত বা উপাসনা ও সাহায্য প্রার্থনাকে আমরা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য খাস করছি। অন্য কারু জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন স্থান নেই।

তাওহীদ তিন প্রকারের। এখানে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করে দেওয়া সঙ্গত মনে হয়। এই প্রকারগুলো হলঃ তাওহীদুর রুবুবিয়াহ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ), তাওহীদুল উলূহিয়াহ (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অসসিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)।

১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহর অর্থ হল, এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, মালিক, রুযীদাতা, নিয়ন্তা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। নাস্তিক ও জড়বাদীরা ব্যতীত সকল মানুষই এই তাওহীদকে স্বীকার করে। এমনকি মুশরিক (অংশীবাদী)রাও এটা বিশ্বাস করতো এবং আজও করে। যেমন কুরআন কারীমে মুশরিকদের এ তাওহীদকে স্বীকার করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, “তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তারা বলবে, আল্লাহ।” (অর্থাৎ, সমস্ত কর্ম সম্পাদনকারী হলেন আল্লাহ।) (সূরা ইউনুসঃ ৩১) অন্যত্র বলেছেন, “যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।” (সূরা যুমার ৩৮) তিনি আরো বলেছেন, “জিজ্ঞেস কর, এই পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জানো ? তারা ত্বরিত্ব বলবে, আল্লাহর; বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি ? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না। জিজ্ঞেস কর, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জানো ? তারা বলবে, আল্লাহর। (সূরা মু‘মিনুন ৮৪-৮৯) এ ছাড়াও আরো অনেক আয়াত আছে।

২। তাওহীদুল উলূহিয়াহর অর্থ হল, সর্ব প্রকার ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহকে মনে করা। আর ইবাদত সেই সব কাজকে বলা হয়, যা কোন নির্দিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় অথবা তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে করা হয়। (অন্য কথায়ঃ ইবাদত প্রত্যেক সেই গুণ বা প্রকাশ্য কথা বা কাজের নাম, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।) সুতরাং কেবল নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জই ইবাদত নয়, বরং কোন সত্তার নিকট দুআ ও আবেদন করা তার নামে মানত করা, তার সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা, তার তাওয়াফ করা এবং তার কাছে আশা রাখা ও তাকে ভয় করা ইত্যাদিও ইবাদত। তাওহীদে উলূহিয়াহ হল (উল্লিখিত) সমস্ত কাজ কেবল মহান আল্লাহর জন্য সম্পাদিত হওয়া। কবরপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত আম-খাস বহু মানুষ তাওহীদে উলূহিয়াতে শির্ক করছে। উল্লিখিত ইবাদতসমূহের অনেক প্রকারই তারা কবরে সমাধিস্থ ব্যক্তিদের এবং মৃত বুয়ুর্গদের জন্য ক’রে থাকে যা সুস্পষ্ট শির্ক।

৩। তাওহীদুল আসমা অসসিফাত হল, মহান আল্লাহর যে গুণাবলী কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে কোন রকমের অপব্যাখ্যা এবং বিকৃত করা ছাড়াই বিশ্বাস করা। আর এই গুণাবলীর অনুরূপ অধিকারী (আল্লাহ ছাড়া) অন্য কাউকে মনে না করা। যেমন, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান (গায়বী খবর) রাখা তাঁর গুণ, দূর ও নিকট

থেকে সকলের ফরিয়াদ শোনার শক্তি তিনি রাখেন, বিশ্বজাহানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার সব রকমের এখতিয়ার তাঁরই; এই ধরনের আরো যত ইলাহী গুণাবলী আছে আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, ওলী এবং অন্য কাউকেও এই গুণের অধিকারী মনে না করা। করলে তা শির্ক হয়ে যাবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, কবরপূজারীদের মধ্যে এই প্রকারের শির্ক ব্যাপক। তারা আল্লাহর উল্লিখিত গুণে অনেক বুয়ুর্গদেরকে অংশীদার বানিয়ে রেখেছে।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

স্নেহ ও করুণা এবং কল্যাণ কামনাসহ কাউকে মঙ্গলময় পথ দেখিয়ে দেয়া ও মনজিলে পৌঁছিয়ে দেয়াকে আরবী পরিভাষায় ‘হেদায়াত’ বলে। হেদায়াত’ শব্দটির দুইটি অর্থ। একটি পথ প্রদর্শন করা, আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। যেখানে এই শব্দের পর দুইটি object থাকবে ঈলা থাকবে না, সেখানে এর অর্থ হবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া। আর যেখানে এ শব্দের পর ঈলা শব্দ আসবে, সেখানে অর্থ হবে পথ-প্রদর্শন। যেমন আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে বলেছেন, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ “নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্যস্থলে—মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন না যাকে আপনি পৌছাতে চাইবেন। বরং আল্লাহই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন [সূরা আল-কাসাস ৫৬] এ আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর ঈলাব্যবহৃত হয়নি বলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া অর্থ হয়েছে এবং তা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধ্যাত্ত নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে পথ প্রদর্শন রাসূলে করীমের সাধ্যাত্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ “হে নবী। আর আপনি অবশ্যই সরল সঠিক দৃঢ় ঋজু পথ প্রদর্শন করেন [সূরা আশ-শূরা: ৫২]

কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তাই তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন, وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا “আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে সরল সোজা সুদৃঢ় পথে পৌঁছিয়ে দিতাম। [সূরা আন-নিসা: ৬৮] সূরা আল-ফাতিহা’র আলোচ্য আয়াতে হেদায়েত শব্দের পর ঈলাশব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এর অর্থ হবে সোজা সুদৃঢ় পথে মনজিলের দিকে চালনা করা। অর্থাৎ যেখানে বান্দাহ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে শুধু এতটুকু বলে না যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সোজা সুদৃঢ় পথের সন্ধান দিন। বরং বলে, হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে চলবার তাওফীক দিয়ে মনজিলে পৌঁছিয়ে দিন। কেননা শুধু পথের সন্ধান পাইলেই যে সে পথ পাওয়া ও তাতে চলে মনজিলে পৌঁছা সম্ভবপর হবে তা নিশ্চিত নয়। কিন্তু সিরাতে মুস্তাকীম কি? সিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে, রাস্তা বা পথ। আর মুস্তাকীম হচ্ছে, সরল সোজা। সে হিসেবে সিরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে, এমন পথ, যা একেবারে সোজা ও ঋজু, প্রশস্ত ও সুগম; যা পথিককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়; যে পথ দিয়ে লক্ষ্যস্থল অতি নিকটবর্তী এবং মনযিলে মাকছুদে পৌঁছার জন্য যা একমাত্র পথ, যে পথ ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছার অন্য কোন পথই হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও রব তোমাদেরও রব, অতএব একমাত্র তারই দাস হয়ে থাক। এটাই হচ্ছে সিরাতুম মুস্তাকীম-সঠিক ও সুদৃঢ় ঋজু পথ [সূরা মারইয়াম: ৩৬] অর্থাৎ আল্লাহকে রব স্বীকার করে ও কেবল তারই বান্দাহ হয়ে জীবন যাপন করলেই সিরাতুম মুস্তাকীম অনুসরণ করা হবে। অন্যত্র ইসলামের জরুরী বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা’আলা বলেন, “আর এটাই আমার সঠিক দৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এই পথ অনুসরণ করে চল। এছাড়া আরও যত পথ আছে, তাহার একটিতেও পা দিও না; কেননা তা করলে সে পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে-ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদেরকে

উপদেশ দিচ্ছেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা ধ্বংসের পথ হতে আত্মরক্ষা করতে পার [সূরা আল-আনআমঃ ১৫৩] একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে যে পথ ও বিধি-বিধান পাওয়া যাবে, তাই মানুষের জন্য সঠিক পথ। আল্লাহ বলেন, “প্রকৃত সত্য-সঠিক-ঋজু-সরল পথ প্রদর্শন করার দায়িত্ব আল্লাহর উপর, যদিও আরও অনেক বাঁকা পথও রয়েছে। আর আল্লাহ চাইলে তিনি সব মানুষকেই হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতেন [সূরা আন-নাহল: ৯]

সিরাতে মুসতাকীমের তাফসীর কোন কোন মুফাসসির করেছেন, ইসলাম। আবার কারও কারও মতে, কুরআন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] বস্তুত: আল্লাহর প্রদত্ত বিশ্বজনীন দ্বীনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত রূপ ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ শব্দ হতে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তা‘আলার দাসত্ব কবুল করে তারই বিধান অনুসারে জীবন যাপন করার পথই হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীম এবং একমাত্র এই পথে চলার ফলেই মানুষ আল্লাহর নিয়ামত ও সন্তোষ লাভ করতে পারে। সে একমাত্র পথই মানব জীবনের প্রকৃত ও চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই সে একমাত্র পথে চলার তওফীক প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এই আয়াতটিতে। কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে এই পথ কিরূপে পাওয়া যেতে পারে? সে পথ ও পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে আল্লাহ এর তিনটি সুস্পষ্ট পরিচয় উল্লেখ করেছেন:

১. এই জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে তা তাদের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে, যারা উক্ত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে আল্লাহর নিকট হতে নিয়ামত ও অসীম অনুগ্রহ লাভ করেছে।
২. এই পথের পথিকদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয় নি, অভিশপ্তও তারা নয়।
- ৩, তারা পথভ্রান্ত লক্ষ্যভ্রষ্টও নয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ কথা কয়টির বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

৬. তাদের পথ, যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ;

এটা আল্লাহর নির্ধারিত সঠিক ও দৃঢ় পথের প্রথম পরিচয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট হতে যে পথ নাযিল হয়েছে, তা অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ তা এমন কোন পথই নয়, যাহা আজ সম্পূর্ণ নূতনভাবে পেশ করা হচ্ছে- পূর্বে পেশ করা হয় নি। বরং তা অতিশয় আদিম ও চিরন্তন পথ। মানুষের এই কল্যাণের পথ অত্যন্ত পুরাতন, ততখানি পুরাতন যতখানি পুরাতন হচ্ছে স্বয়ং মানুষ। প্রথম মানুষ হতেই এটা মানুষের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে, অসংখ্য মানুষ এ পথ প্রচার করেছেন, কবুল করার আহ্বান জানিয়েছেন, এটা বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিকট হতে, অপূর্ব নিয়ামত ও সম্মান লাভের অধিকারী প্রমাণিত হয়েছেন। এই নিয়ামত এই দুনিয়ার জীবনেও তারা পেয়েছেন, আর আখেরাতেও তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

মূলত: আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের চলার পথ ও অনুসৃত জীবনই হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য একমাত্র পথ ও পন্থা। এতদ্ব্যতীত মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, অনুসরণীয় ও কল্যাণকর পথ আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোক কারা এবং তাদের পথ বাস্তবিক পক্ষে কি? এর উত্তর অন্য আয়াতে এসেছে, “যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা করলে তাদের ভাল হত এবং চিত্তস্তিরতায় তারা দৃঢ়তর হত। এবং তখন আমি আমার কাছ থেকে তাদেরকে নিশ্চয় মহাপুরস্কার প্রদান করতাম এবং তাদেরকে নিশ্চয় সরল পথে পরিচালিত করতাম। আর কেউ আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ (যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন) তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী! এগুলো

আল্লাহর অনুগ্রহ। সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট [সূরা আন-নিসাঃ ৬৬-৭০) এ আয়াত থেকে সঠিক ও দৃঢ় জীবন পথ যে কোনটি আর আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকগণ যে কোন পথে চলেছেন ও চলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাবার অধিকারী হয়েছেন তা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। তারা হচ্ছেন আশিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীন।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

৭. যাদের উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

যাদের উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হয়নি- এটা আল্লাহর নির্ধারিত সিরাতুল মুস্তাকীম এর দ্বিতীয় পরিচয়। আল্লাহ তাআলা যে পথ মানুষের সম্মুখে চিরন্তন কল্যাণ লাভের জন্য উপস্থাপিত করেছেন সে পথ অভিশাপের পথ নয় এবং সে পথে যারা চলে তাদের উপর কখনই আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে না। সে পথ তো রহমতের পথ বরং সে পথের পথিকদের প্রতি দুনিয়াতে যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্য বর্ষিত হয়ে থাকে, আখেরাতেও তারা আল্লাহর চিরস্থায়ী সন্তোষ লাভের অধিকারী হবে। এই আয়াতাংশের অপর একটি অনুবাদ হচ্ছে, “তাদের পথ নয় যাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়েছে।” এরূপ অনুবাদ করলে তাতে ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ ছাড়া আরও একটি পথের ইঙ্গিত মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়, যা আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত এবং সেই পথ হতে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য মনে হয়। কিন্তু এখানে আল্লাহ মূলতঃ একটি পথই উপস্থাপিত করেছেন এবং একটি পথেরই ইতিবাচক দুইটি বিশেষণ দ্বারা সেটাকে অত্যধিক সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। তাই অনেকেই পূর্বোক্ত প্রথম অনুবাদটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [উভয় অর্থের জন্য দেখুন, যামাখশারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] প্রথম অনুবাদ বা দ্বিতীয় অনুবাদ যাই হোক না কেন এখানে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে প্রকারান্তরে এমন পথ ও পন্থা গ্রহণ হতে বিরত থাকবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর অভিশাপের পথ, যে পথে চলে কোন কোন লোক অভিশপ্ত হয়েছে।

কিন্তু সে অভিশপ্ত কারা, কারা কোন পথে চলে আল্লাহর নিকট হতে অভিশপ্ত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেয়া আবশ্যিক। কুরআন মজীদ ঐতিহাসিক জাতিদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ “আর তাদের উপর অপমান লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত হানা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে। [সূরা আল-বাকারাহ: ৬১] পূর্বাপর আলোচনা করলে নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে পারা যায় যে, এ কথাটি ইয়াহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাই মাগদুব বলতে যে এখানে ইয়াহুদীদের বুঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে সমস্ত মুফাসসিরই একমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসেও অনুরূপ স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে [দেখুন, মুসনাদে আহমাদ ৫/৩২,৩৩]

যারা পথভ্রষ্টও নয়- এটি সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর তৃতীয় ও সর্বশেষ পরিচয়। অর্থাৎ যারা সিরাতুল মুস্তাকীম এ চলে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করতে পেরেছেন তারা পথভ্রষ্ট নন-কোন গোমরাহীর পথে তারা চলেন না। পূর্বোল্লিখিত আয়াতের ন্যায় এ আয়াতেরও অন্য অনুবাদ হচ্ছে, তাদের পথে নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, যারা গোমরাহ হয়ে আল্লাহর উপস্থাপিত পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে এ পথ-ভ্রষ্ট লোকদের পরিচয় জানতে পারা যায় যে, দুনিয়ার ইতিহাসে নাসারাগণ হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত এ গোমরাহ ও পথ-ভ্রষ্ট জাতি। [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩২,৩৩, ৭৭] কোন মুসলিম যখন সূরা ফাতিহা পাঠ করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথাই ঘোষণা করে যে, “হে আল্লাহ আমরা স্বীকার করি, আপনার সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে যে জীবন-ধারা গড়ে উঠে তা-ই একমাত্র মুক্তির পথ। এজন্য আপনার নির্ধারিত এ পথে

চলে যারা আপনার নিয়ামত পেয়েছেন সেই পথই একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথ, আল্লাহ সেই পথেই আমাদেরকে চলবার তাওফীক দিন। আর যাদের উপর আপনার অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে ও যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাদের যেন আমরা অনুসরণ না করি। কেননা, সে পথে প্রকৃতই কোন কল্যাণ নেই। বস্তুতঃ পবিত্র কুরআন দুনিয়ার বর্তমান বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সর্বশেষ আল্লাহর দেয়া গ্রন্থ। এর উপস্থাপিত আদর্শ ও জীবন পথই হচ্ছে বিশ্বমানবতার একমাত্র স্থায়ী ও কল্যাণের পথ। এর বিপরীত সমস্ত জীবনাদর্শকে মিথ্যা প্রমাণ করে একমাত্র এরই উপস্থাপিত আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদেরকে গঠন করা মুসলিমদের একমাত্র দায়িত্ব। মুসলিমরা আজও সেই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হলে সূরা আল ফাতিহা তাদের জীবনে সার্থক হবে।

মূলতঃ যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দোআ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দোআ কবুল করবেন। হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ইমাম গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদদ্বলীন বলে তখন তোমরা ‘আমীন’ বা ‘হে আল্লাহ কবুল কর’ একথাটি বল; কেননা যার কথাটি ফেরেশতাদের কথা অনুযায়ী হবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয় হবে” [বুখারী: ৭৮২, মুসলিম ৪০৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন ইমাম ‘গাইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বলীন’ বলে তখন তোমরা আমীন বা ‘হে আল্লাহ কবুল কর’ একথাটি বল; এতে আল্লাহ তোমাদের আহবানে সাড়া দিবেন (দোআ কবুল করবেন) [মুসলিম ৪০৪] অন্য একহাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াহুদীরা তোমাদেরকে সালাম ও আমীন বলার চেয়ে বেশী কোন বিষয়ের উপর হিংসা করে না।” [ইবন মাজাহ: ৮৫৬]

ফুটনোট

- সূরা ফাতিহার প্রসিদ্ধ কয়েকটি নাম হলো:- উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, আস-সাব'উল মাছানী, আল-কুরআনুল 'আযীম, আল-হামদু, সালাত, রুক্বিয়াহ, ফাতিহাতুল কিতাব
- সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে সূরা ফাতিহা নাযিল হয়।
- সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন - এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।
- কুরআন বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু হয়েছে, যেকোনো কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করুন। এটি একটি সুন্নাহ, এটি আল্লাহর বারাকাহ নিয়ে আসে এবং এটি আপনাকে আপনার কাজের পিছনের উদ্দেশ্যের কথাও মনে করিয়ে দিবে।
- সূরা আল ফাতিহায় আল্লাহর কয়েকটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে; আল্লাহ, রব, আর-রহমান, আর-রহিম, মালিক। "আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন" এই দোয়া করার আগে আল্লাহ বিভিন্ন নাম/সীফাত উল্লেখ করা হয়েছে, ডাকা হয়েছে। দোয়া কবুলের এইটাও একটা পন্থা আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামে ডেকে আল্লাহর কাছে চাওয়া।
- হামদ অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সীফাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হামদ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে।
- 'আলামীন' বহুবচন শব্দ, একবচনে 'আলাম'। সৃষ্টিজগতকে আলাম এবং বহুবচনে আলামীন বলা।

- 'রব' শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু-লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ-সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।
- আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, তিনি তিনি কেবল 'রব্বুল আলামিন, আর-রহমান ও আর-রহিমই নন, তিনি “মালিকি ইয়াওমদিন”-ও। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল এই জীবনের লালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই এই বিরাট জগত-কারখানা স্থাপন করেন নি, এর একটি চূড়ান্ত পরিণতিও তিনি নির্ধারিত করেছেন।
- তাওহীদ তিন প্রকারের। এই প্রকারগুলো হলঃ তাওহীদুর রুব্বিয়াহ (প্রতিপালকত্বের একত্ববাদ), তাওহীদুল উলূহিয়াহ (উপাস্যত্বের একত্ববাদ) এবং তাওহীদুল আসমা অসসিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ)।

এই সূরায় আল্লাহর যে পরিচয়গুলো ফুটে এসেছে-

- সকল প্রশংসার একমাত্র দাবীদার
- বিশ্বজাহানের রব
- তিনি রাহমান
- তিনি রাহীম
- তিনি মালিকি ইয়াওমদিন
- একমাত্র ইবাদত পাওয়ার অধিকারী
- তিনি সাহায্য কারী
- তিনি হেদায়াত দানকারী

সিরাতুল মুস্তাকীমের পরিচয়

- তাদের পথ, যাদেরকে আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন;
- এটা তাদের পথ, যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ/অভিশাপ আপতিত হয়নি-
- তাদের পথ, যারা পথভ্রষ্টও নয়।
- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এতে আল্লাহর তাওহীদ সাব্যস্ত হয়েছে।
- اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ এতে রাসূলের আনুগত্যের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।
- নি'আমতপ্রাপ্তদের উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক তাদের সম্মানিত করা ও প্রশংসা করা হয়েছে।
- সূরা ফাতেহা হচ্ছে দো'আ, এই সূরার মাধ্যমে দোয়ার আদব শিখে দেয়া হচ্ছে তাই এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দোয়া করলে দোয়া কবুল হবে। তবে এর সাথে সাথে স্মরণ রাখতে হবে যে আল্লাহ তা'আলা অমনোযোগী অন্তর থেকে দো'আ কবুল করেন না।

যারা সূরা আল-ফাতিহার অর্থ বুঝে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ শেষ করার পর তাদের মন থেকে দোআ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের দোআ কবুল করবেন। সূরা ফাতিহা আমাদের প্রতিদিন প্রতি রাকাতে নামাজে পড়তে হয় তাই আসুন সূরা ফাতিহা ভালো করে বুঝার চেষ্টা করি এবং এর শিক্ষা ও ফযীলতগুলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি।

সমাপ্ত